



‘সাদাসিধে’ কথা ■ মুহম্মদ জাফর ইকবাল

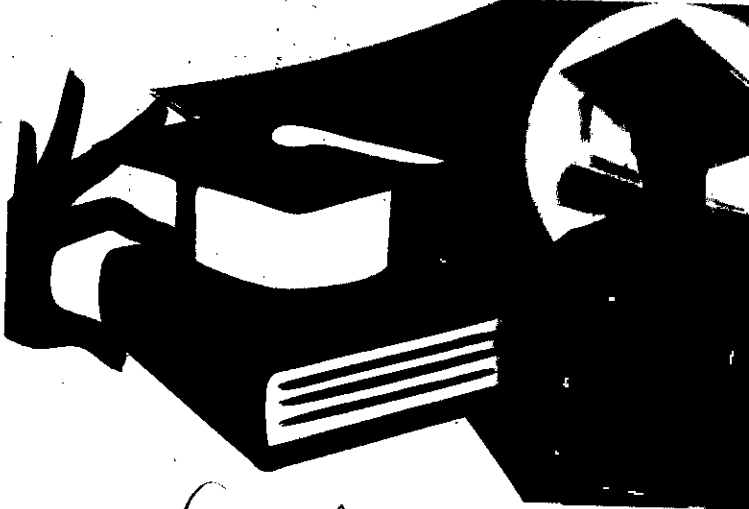
আমার ভাঙা রেকর্ড

আশা করে আছি কোনো
এক সময় সরকার বুঝতে
পারবে—পদ্মা ব্রিজ কিংবা
গভীর সমুদ্রের বন্দর কিংবা
নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র
থেকেও অনেক বেশি
গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লেখাপড়া,
আর সত্যি সত্যি আমরা
দেখব—লেখাপড়ার জন্যে
বরাদ্দ তিন গুণ বেড়ে গেছে।
তারপর চোখের পলকে
আমরা এই দেশে একটা
ম্যাজিক ঘটে যেতে দেখব।
যতদিন সেটি না হচ্ছে
ততদিন আমি আমার এই
ভাঙা রেকর্ডটি বাজিয়েই যাই!

আমরা আবিষ্কার করি জিপিএ ফাইভ পাওয়া অনেক সেখানে পাস মার্কটুকুও তুলতে পারে না। আমাকে একজন হিসেব করে দেখিয়েছেন, একেবারে কোনো রকম লেখাপড়া না করেই খাট থেকে সত্তর মার্ক পাওয়া সম্ভব। প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার ২৫ মার্ক একেবারে ছাঁকা অবস্থায় একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রীকে দিয়ে দেওয়া হয়। এমসিকিউ ৩৫ মার্কও ছেলেমেয়েরা পুরোটাই পেয়ে যায়। পরীক্ষার হলে যদি একজন ছাত্র বা ছাত্রীও এমসিকিউ এর উত্তর জানে সে তাদের নিজস্ব সিগন্যাল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হলের সবাইকে সেটা জানিয়ে দিতে পারে। আজকাল না কি তারও প্রয়োজন হয় না। অনেক শিক্ষক নিজেরাই ছাত্রছাত্রীদের পুরো উত্তরটুকু বলে দেন। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে সেগুলো স্মার্টফোনে চলে আসে, তখন অভিভাবকেরা নিজেরাই যন্ত্র করে তাদের ছেলে-মেয়েদের সেগুলো মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকিয়ে দেন। কাজেই একজন ছেলে একেবারে কিছু না পড়েই প্রাকটিক্যাল আর এমসিকিউ মিলিয়ে খাট নম্বর পেয়ে যায়। মূল প্রশ্নের উত্তরে যদি কিছু না জেনেও একেবারে যা ইচ্ছা তাই লিখে দিয়ে আসে, তাহলেও একেবারে বেশ কিছু নম্বর পেয়ে যায়, কারণ সব পরীক্ষকের কাছ বেশি বেশি নম্বর দেওয়ার অলিখিত নির্দেশ রয়েছে। কাজেই মূল প্রশ্ন থেকে যদি কোনোভাবে কুড়ি নম্বর ম্যানিজ করে ফেলা যায় তাহলেই

কোটিংয়ে পড়াবেন—এই ভয়ংকর অভিযাপ থেকে আমরা কখন মুক্তি পাব কে জানে? পড়ালেখা করার জন্য দরকার দুই নম্বর বিষয়টি হচ্ছে—পরীক্ষা পদ্ধতি। দেশের শিক্ষার মান ভালো করার এটা হচ্ছে সবচেয়ে সোজা উপায়। প্রত্যেকটা ছেলেমেয়েই পরীক্ষায় ভালো করতে চায়। যদি পরীক্ষা পদ্ধতিটি খুব ভালো হয় তাহলে সেই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য ছেলেমেয়েরা যখন প্রাণপণ চেষ্টা করে, তখন নিজে থেকেই যেটুকু শেখার কথা সেটুকু শিখে নেয়। প্রশ্নগুলো এমনভাবে করতে হবে যেন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ভালো করে লেখাপড়া করার বাইরে আর অন্য কোনো শর্টকাট না থাকে। এই দেশের আগের গণবাধা প্রশ্নপদ্ধতি পাল্টে যখন নতুন সৃজনশীল পদ্ধতি শুরু করা হয়েছিল তখন আমরা সবাই আশা করেছিলাম যে, সত্যিকারের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে, কিন্তু যখন আবিষ্কার করেছি প্রশ্নগুলোর জন্য গাইড বইয়ের উপর নির্ভর করতে শুরু করা হচ্ছে—তখন বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার রাস্তা থাকল না। সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ হয় যখন দেখি আমাদের দেশের প্রথম সারির খবরের কাগজগুলো একেবারে নিয়মিতভাবে গাইড বই ছাপিয়ে যাচ্ছে। এতো বড় বড় সংবাদপত্র তারা তো নিশ্চয়ই ভুল করতে পারে না ভেবে দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে খবরের কাগজের গাইড বই মুখস্থ

বইয়ের আনন্দটুকুই শুধু দেখে আসছে, কিন্তু এটি নিশ্চিত করার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত এনসিটিবি যে তাদের পুরো শক্তিকু বই ছাপানোর পিছনে ব্যয় করে ফেলেছে, সেটি অনেকেই জানে না। এনসিটিবি এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটি প্রশাক্ষক, এই কথাটি মোটেও অতুক্তি নয়। কোটি কোটি বই ছাপানো কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয় এবং যেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করবেন—সেটি বিচিত্র কিছু নয়। ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবই ছাপানোর প্রতি মহৎ কাজের মাঝে যে বাণিজ্য এসে জায়গা করে নেবে না এবং সেখানে নানা ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি আর অপকর্ম ঘটতে থাকবে না—সেটা কেউ নিশ্চিত করতে পারবে না। বই ছাপানোর এই বিশাল প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা মাঝে মাঝে যে অতি বিচিত্র চক্রান্তের কথা শুনি, তার মাঝে নিশ্চয়ই অনেক সত্যতা আছে। এর ভেতরে বই ছাপানোর উপযুক্ত অবকাঠামো থাকার পরও যে সেগুলো ভরত কিংবা চীন থেকে ছাপিয়ে আনতে হচ্ছে, তার পেছনেও নিশ্চয়ই অনেক ঘটনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এনসিটিবি-এর হাতে শুধু কারিকুলাম তৈরি করা, পাঠ্যবই লেখানো, সম্পাদনা করা—এই ধরনের কাজগুলো রেখে ছাপানো এবং বিতরণের পুরো বাণিজ্যিক অংশটুকু অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।



সেটা জিপিএ ফাইভ। কাজেই আমরা মার্ক মাঝেই যখন আবিষ্কার করি একেবারে কিছুই জানে না, কিন্তু একজন জিপিএ ফাইভ পেয়ে বসে আছে, তখন অনুমান করে নির্ভর হয় নিশ্চয়ই এরকম কোনো একটি ঘটনা ঘটেছে। অথচ আমাদের দেশে লেখাপড়ার ব্যাপারটার এরকম দিশেহারা অবস্থা হওয়ার কথা ছিল না। ভালো লেখাপড়া করার জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের দরকার। শিক্ষক, পরীক্ষা পদ্ধতি আর পাঠ্যবই। এর মাঝে সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে ভালো শিক্ষক। রাতারাতি বাংলাদেশের সব স্কুলের শিক্ষকদের জাদুঘর দিয়ে ভালো শিক্ষক পাল্টে দেওয়া যাবে—সেটা আমরা কেউ আশা করি না। আমরা যদি একটা ভালো স্কুলের খবর পাই তাহলে একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। সেই স্কুলে একজন হলেও খুব ভালো শিক্ষক আছেন। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হলেও যে কিছু কিছু ভালো শিক্ষক আছেন সেজন্য এখনো এই দেশটিতে লেখাপড়া হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে আমরা এই কথাগুলো আরো জোর দিয়ে বলতে পারছি না। এখন মোটামুটি আমরা সবাই জেনে গিয়েছি স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে শিক্ষকদের অনেকেই অনেক ধরনের ট্রেনিং নেওয়ার পরও সৃজনশীল প্রশ্ন করতে পারেন না। তাই তারা গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দেন। ছেলেমেয়েদের তাই পাঠ্যবইটির সাথে সাথে আত্ম একটা গাইড বই মুখস্থ করতে হয়। আমি প্রায় নিয়মিতভাবে দেশের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে চিঠিপত্র, ই-মেইল পাই—যেখানে তারা আমাকে তাদের শিক্ষকদের নিয়ে ভয়ংকর ভয়ংকর অভিযোগ করে, যার সবচেয়ে গুরুতরটি হচ্ছে টাকাপয়সা নিয়ে জোর করে প্রাইভেট পড়ানো এবং তাদের কাছে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে দেওয়া। অভিযোগগুলোতে সত্যতা আছে, কারণ আমরা সবাই জানি একেবারে দুধের শিশুটিকেও আজকাল প্রাইভেট না হয় কোটি পড়তে পাঠানো হয়। যে শিশুটির নিজে নিজে পড়ালেখা করার ক্ষমতা আছে তাকেও প্রাইভেট আর কোটিংয়ে অভ্যস্ত করিয়ে আমরা তার আত্মবিশ্বাসের একেবারে বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিই। যে শিক্ষকেরা জেনেছেন আমাদের ছেলেমেয়েদের এভাবে সর্বনাশ করে যাচ্ছেন তাদের কোনোভাবে ক্ষমা করা যায় না। ক্লাসে পড়াবেন না, কিন্তু

করে যাচ্ছে! বড় বড় জ্ঞানী-গুণী সম্পাদকদের ভিতরে বিন্দুমাত্র অপরাধ বোধ নেই, বিন্দুমাত্র মানি নেই যে তারা তাদের পত্রিকায় কিশোর-তরুণদের মানসিক বিকাশের মতো কোনো লেখা না ছাপিয়ে তাদের বুদ্ধিমত্তাকে গলাটিপে শেষ করার জন্যে গাইড বই ছাপিয়ে যাচ্ছেন—এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি? আমার হিসেবে লেখাপড়া করার জন্যে তিন নম্বর বিষয়টি হচ্ছে—ভালো পাঠ্যপুস্তক। আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রায় সবাই এখন প্রাইভেট কোটিংয়ের জালে আটকা পড়ে আছে। এই জাল থেকে তাদের মুক্ত করে আনার সবচেয়ে সোজা পথ হচ্ছে চমৎকার কিছু পাঠ্য বই। যদি পাঠ্যবইগুলো খুব ভালো হয় তাহলে ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সেটা পড়ে সেখান থেকে বিষয়বস্তু শিখে নিতে পারবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা পাঠ্যবইগুলো নিয়ে সেরকম কিছু বলতে পারি না। আমি বিজ্ঞানের মানুষ অথচ আমি বিজ্ঞানের পাঠ্যবই দেখেছি তার অনেক বিষয় পড়ে আমি নিজেই কিছু বুঝতে পারি না। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা সেগুলো পড়ে কী বুঝবে? বইগুলোও ছাপা হয় এমন দায়সারাতাবে যে, সেগুলো দেখে মনের ভেতরে নতুন বই দেখার যে আনন্দ হওয়ার কথা—সেটাও হয় না। শুধু তাই নয়, অনেক পাঠ্যবইয়ের সাইজ ছোট করে ফেলা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা সেই সংক্ষিপ্ত বই পড়ে কিছু বোঝে না, পুরনো বই খুঁজছে বেড়ায়। আমার ধারণা যদি যন্ত্র করে একটি একটি করে সবগুলো পাঠ্যবই অনেক সুন্দর করে লেখা হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই সেই পাঠ্যবই পড়ে নিজেরাই অন্য কারো সাহায্য না নিয়ে তাদের বিষয়বস্তু শিখে নিতে পারবে। ভালো শিক্ষক, প্রাইভেট টিউটর, কোচিং কিংবা গাইড বইয়ের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না। পাঠ্যবই নিয়ে কথা বলতে হলে পাঠ্যবই ছাপানোর দক্ষতাজ্ঞের কথাটিও একবার না বললে হবে না। দেশের সব ছেলেমেয়ের হাতে বছরের প্রথমদিন নতুন বই তুলে দেবার মতো অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা প্রতি বছর ঘটে যাচ্ছে। আমার মনে হয় নতুন বই হাতে একটা শিশুর মুখের আনন্দের হাসিটুকুর মতো সুন্দর একটা দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই। দেশের বেশিরভাগ মানুষ নতুন বছরে নতুন

লেখাপড়া নিয়ে যখনই আমি কিছু লিখি তখনই আমি আমার ভাঙা রেকর্ডটা বাজাই, কাজেই এবারেও সেটা বাকি থাকবে কেন? এবারেও আমি আরো একবার বাজাই? আমরা জানি, বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর সামনে অস্বীকার করে এসেছিল যে, শিক্ষার পেছনে দেশের জিডিপির শতকরা ছয় ভাগ খরচ করবে। আমরা এখন এটাও জানি শতকরা ছয় শতাংশ দূরে থাকুক লেখাপড়ার পিছনে খরচ এখন তিন শতাংশ না, দুই শতাংশ থেকে একটু বেশি। আমাদের পাশের দেশ ভারতবর্ষে সেটা চার শতাংশ—অর্থাৎ আমাদের মতো দেশের চেয়েও বেশি। আমরা যখনই ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করি তখন গভীর এক ধরনের মনবদনা নিয়ে লক্ষ্য করি আমরা আমাদের দেশে লেখাপড়ার মতো বিষয়টাকে কতো হেলাফেলা করে দেখি। আমি যতটুকু জানি সারা পৃথিবীর লেখাপড়ার পিছনে যে দেশগুলো সবচেয়ে কম টাকা খরচ করে—বাংলাদেশ হচ্ছে তার একটি। আমার মাঝে মাঝে নিজেকে চিমটি কেটে দেখতে হয় সত্যিই আমি জেগে আছি কি না এবং সত্যিই এতো কম টাকা খরচ করে আমরা আমাদের কোটি কোটি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে যাচ্ছি—ব্যাপারটি সত্যি কি না। আমাদের দেশের অর্থনীতি আগের থেকে কতো বেশি শক্ত হয়েছে, অথচ এখনো আমাদের নীতিনির্ধারণেরা দেশের লেখাপড়ার গুরুত্বটা বুঝে লেখাপড়ার পিছনে আরো একটু বেশি টাকা কেন খরচ করেন না—আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। যদি আমরা আমাদের লেখাপড়ার পিছনে পাশের দেশ ভারতবর্ষের সমান হারও টাকা খরচ করতাম তাহলেই এই দেশে রীতিমত ম্যাজিক হয়ে যেত। স্কুলের বিন্দিগুলো ঠিক করা যেত, আরো অনেক বেশি দক্ষ শিক্ষক নেওয়া যেত, ক্লাসরুম আধুনিক করা যেত, স্কুলে স্কুল সুন্দর ল্যাবরেটরি করা যেত, কামরার লাইব্রেরি করা যেত, বাচ্চাদের দুপুরে নাস্তা দেওয়া যেত, বাকবাকি ছাপায় চার রঙের পাঠ্যবই দেওয়া যেত, হাওর অঞ্চলে বর্ষাকালে শিপডাবোটে করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা যেত, পাছাডি অঞ্চলে স্কুলে স্কুলে হোস্টেল রাখা যেত, ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা যেত, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে আধুনিক স্কুল বাস দেওয়া যেত, তাদের দল বেধে চিড়িয়াখানা কিংবা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া যেত—এই তালিকাকে আমি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করতে পারি। কিন্তু তালিকাটির দিকে তাকিয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাসই ফেলতে হবে, তাই তালিকাটি আর দীর্ঘ করতে চাই না। আশা করে আছি কোনো এক সময় সরকার বুঝতে পারবে—পদ্মা ব্রিজ কিংবা গভীর সমুদ্রের বন্দর কিংবা নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লেখাপড়া, আর সত্যি সত্যি আমরা দেখব—লেখাপড়ার জন্যে বরাদ্দ তিন গুণ বেড়ে গেছে। তারপর চোখের পলকে আমরা এই দেশে একটা ম্যাজিক ঘটে যেতে দেখব। যতদিন সেটি না হচ্ছে ততদিন আমি আমার এই ভাঙা রেকর্ডটি বাজিয়েই যাই!

● লেখক: কথাসাহিত্যিক, শিক্ষক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট